#আমি পদ্মজা পর্ব ৫৮

_____
রাতের আঁধার কেটে ভোরের আলোর মাধ্যমে শুরু হয়েছে আরেকটি নতুন দিন। পূর্ণা ও মগা মেঠোপথ ধরে হাওলাদার বাড়ি যাচ্ছে। মাথার উপর আকাশ আলো করা তেজবিহীন সূর্য। পূর্ণার পায়ের গতি চঞ্চল। সে অস্থির হয়ে আছে। পাশেই কৃষকের ফসলি জমি ছেয়ে গেছে সবুজের সমারোহে। ফসলি জমির সবুজ আর ঘাস, গাছ-পালার ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দু সকালের প্রকৃতিতে এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। অথচ সেই সৌন্দর্য পূর্ণাকে ছুঁতে পারছে না। অন্যবেলা হলে সে শিশিরভেজা ঘাসে গা এলিয়ে দিত। কোনো এক অদ্ভুত কারণে ঠান্ডার মধ্যেও তার শিশিরে ভিজতে ভালো লাগে। এখন সেই মন মেজাজ নেই। মগা কিছুক্ষণ আগে তাকে খবর

দিয়েছে, গতকাল রাতে পদ্মজা আহত অবস্থায় জঙ্গল থেকে ফিরেছে। প্রেমা ঘরে পড়ছিল। বাসন্তী রান্নাঘরে। তাই তারা শুনতে পায়নি। পূর্ণা রোদে বসে সকালের খাবার খাচ্ছিল। যখন মগার কাছ থেকে এই খবর শুনল, খাবার রেখে মগাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কুয়াশা ঢাকা পথে উত্তরে হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে পূর্ণা হাওলাদার বাড়ি আসে। এক ছুটে পদ্মজার ঘরে যায়। পদ্মজা ঘুমে। শিয়রে ফরিনা বসে আছেন। পূর্ণা করুণস্বরে জানতে চাইল,'ও খালাম্মা,আপার কী হয়েছে?'

ফরিনা ইশারায় শান্ত হতে বললেন। তারপর মুখে ধীরেসুস্থে রাতের ঘটনা খুলে বললেন। গতকাল এশার আযানের সময় পদ্মজা কোথা থেকে দৌড়ে সদর ঘরে এসে লুটিয়ে পড়ে। পা থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল। অনেকগুলো কাঁটা ফুঁটে ছিল। শ্বাস নিচ্ছিল

ঘন ঘন। গালের চামড়ারও একই অবস্থা। ফরিনা,লতিফা,আমিনা,রিনু পদ্মজাকে দেখে চমকে যায়। আমিনা দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও,বাকি তিনজন পদ্মজাকে ধরে ঘরে নিয়ে আসে। পদ্মজা পানি খেতে চায়। পানি খাওয়ার পর বলে,সে জঙ্গলে গিয়েছিল। জঙ্গলের কথা শুনে উপস্থিত দুজন কাজের মেয়ে ও ফরিনার মুখ পাংশুটে হয়ে যায়। তারা আর প্রশ্ন করেনি। যেন বুঝে গিয়েছে কি হয়েছিল! কাঁটা বের করতে গিয়ে আরো রক্তক্ষরণ হয়েছে। পদ্মজা যন্ত্রনায় ঠোঁট কামড়ে শুয়েছিল। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়েছে। ব্যান্ডেজ করা খুব দরকার ছিল। কাটাছেঁড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ফরিনার ধারণা নেই। তাই তিনি মজিদ হাওলাদরকে গিয়ে বলেন। এই বাড়িতে প্রায়ই মারামারি, কাটাকাটি চলে। তাই মজিদ হাওলাদারের কাছে ব্যান্ডেজ,স্যাভলনসহ

বিভিন্ন জিনিসপাতি রয়েছে। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপাতি নিয়ে আসেন। তারপর পদ্মজার পা ভালো করে পরিষ্কার করিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন।

পূর্ণা পদ্মজার পায়ের কাছে বসে হাহাকার করে বলল,'আমার আপা এতো কষ্ট পেয়েছে!'
পূর্ণার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। সে ফরিনার কাছে জানতে চায়,'ভাইয়া কোথায়?'
তাৎক্ষণিক ফরিনার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তিনি মিনমিনে গলায় বললেন,'জানি না।'
পূর্ণা অবাক স্বরে বলল,'ভাইয়া জানে না আপার কথা? রাতে দেখেনি?'
'বাবু তো বাড়িত আহেই নাই। রানিরে যে খুঁজতে গেল আর আইছে না।'
'রানি আপারে পাওয়া যায়নি?'

‘না।’
‘আচ্ছা-
পদ্মজা শরীর নাড়াচ্ছে দেখে পূর্ণা কথা থামিয়ে দিল। সে পদ্মজার পেটের কাছে এসে বসল। বলল,’আপা।’
পদ্মজা পিটপিট করে চোখ খুলে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো টুপ করে পদ্মজার চোখেমুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পদ্মজা দ্রুত চোখ বুজে ফেলল। তারপর আবার ধীরে ধীরে চোখ খুলল। পূর্ণাকে দেখে অবাক হয়। উঠে বসতে চাইলে অনুভব করে পায়ে অনেক ব্যথা। সে পায়ের দিকে চেয়ে আরও অবাক হলো। পায়ে ব্যান্ডেজ এলো কী করে! মনে করার চেষ্টা করল। মনে মনে বিড়বিড় করে বলল,’রাতে এক ছুটে অন্দরমহলে চলে আসি। ভুলেও পিছনে ফিরে তাকাইনি। সদর ঘর থেকে আম্মা ঘরে নিয়ে আসেন। আব্বা ব্যান্ডেজ করে দেন। আম্মা

খাইয়ে দেন। অনেক রাত হয়। উনি তখনও ফিরেননি। তাই চিন্তা হয়। আম্মাকে জিজ্ঞাসা করলে আম্মা বলছিলেন,চলে আসবে। তারপর কি হয়েছিল মনে নেই। ঘুমিয়ে পড়ি বোধহয়।’
পদ্মজা ভাবনা থেকে বেরিয়ে সর্বপ্রথমে ফরিনাকে প্রশ্ন করল,’উনি ফিরেছেন?’
‘না।’
পদ্মজা কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে অনেক্ষণ পর বলল,’চাচা আর রিদওয়ান ভাই ফিরেছে?’
‘আইছে তো। তোমার চাচা এহন কই জানি না। রিদওয়ান হের ঘরেই আছে।’
‘তাহলে আপনার ছেলে কোথায় আম্মা?’
পদ্মজা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পূর্ণা পদ্মজার এক হাতে চেপে ধরে অনুরোধ করে,’আপা,শান্ত হও। খালাম্মা, রিদওয়ান ভাই আর ছোট চাচা কিছু বলেনি ভাইয়ার ব্যাপারে?

আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?’
ফরিনা নির্বিকার স্বরে বললেন,’আমি হেরার লগে কথা কই না।’
‘আপনার ছেলের জন্য আপনার চিন্তা হচ্ছে না? রাতে বাড়ি ফেরেনি। আপনি তো মা না-কি?’ পদ্মজার গলা কাঁপছে। তার বুকের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। আমিরের কিছু হলে সে মাঝ সমুদ্রে পড়বে। হেমলতার পর এই একটা মানুষকেই সে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে,ভালোবাসে। ফরিনা নিশ্চুপ। তিনি পদ্মজার কথা পাত্তা দিচ্ছেন না। পদ্মজার পা ব্যথায় টনটন করে উঠে। শীতের সময় কাটাছেঁড়া খুব যন্ত্রনার। যে যন্ত্রনায় পূর্ণা এখনও ভুগছে। সেদিন কাঁধে আঘাত পেল। আজও শুকায়নি ভালো করে। কিছুর ছোঁয়া লাগলেই ব্যথা করে। পূর্ণা পদ্মজাকে অনুরোধ করে বলল,’আপা,এমন করো না। ভাইয়া চলে আসবে। রানি আপাকে খুঁজতে গেছে। এজন্যই

আসতে পারেনি।’
‘রানি আপার বাপ-ভাই তো চলে আসছে।’
‘তুমি তো জানোই আপা,রানি আপার বাপ-ভাই কেমন। রানি আপার জন্য মায়া শুধু ভাইয়ার। তাই ভাইয়া রানি আপারে ছাড়া আসতে পারছে না।’
পূর্ণার কথাগুলো যুক্তিগত হলেও পদ্মজার মন মানছে না। গোলমাল তো আছেই। পদ্মজা পূর্ণাকে এক হাতে সরিয়ে বিছানা থেকে নামার জন্য এক পা মেঝেতে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীরে একটা সূক্ষ্ম তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ে। ফরিনা ও পূর্ণা আঁতকে উঠল। পদ্মজাকে জোর করে শুইয়ে দিল। কিন্তু পদ্মজা নাছোড়বান্দা, সে তার স্বামীর খবর যতক্ষণ না পাবে শান্ত হবে না। ফরিনা আশ্বস্ত করে বললেন,’ওরা বাবুর ক্ষতি করব না। বাবুর কাছে ওদের অনেক কিছু পাওনের আছে। কাগজে-কলমে এই বাড়িডার

মালিক বাবু।’
পদ্মজা তীর্যকভাবে তাকাল। বলল,’আপনি সব জানেন তাই না?’
পূর্ণা ফোড়ন কাটে,’কী জানবে?’
পূর্ণার উত্তর না দিয়ে পদ্মজা ফরিনাকে প্রশ্ন করল,’বলুন আম্মা।’
ফরিনা আড়চোখে দরজার দিকে তাকালেন। ফরিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে পদ্মজা,পূর্ণাও তাকাল। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ি দেখে মনে হচ্ছে,লতিফা। পূর্ণা ডাকতে উদ্যত হয়। পদ্মজা পূর্ণার হাত ধরে ফেলে। ইশারা করে চুপ থাকতে। তারপর ফরিনাকে প্রশ্ন করে,’তাহলে আপনি নিশ্চিত ওরা উনার ক্ষতি করবে না?’
‘জানে মারব না।’
এ কথা শুনে পদ্মজা হকচকিয়ে যায়। সে উৎকর্ণ হয়ে বলল,’এ কথা কেন বলছেন?’
ফরিনা আবার নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পদ্মজার

মাথার রগ রাগে দপদপ করছে। এই বাড়ির মানুষগুলোর মনের ভাবনার কিনারা এতো জটিল! কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। একেকবার একেকজনের একেক রূপ।

পদ্মজাকে সারাদিন এটা-ওটা বলে বিছানায় রাখা হয়। ফরিনা সারাদিন পদ্মজার খেয়াল নিলেন। পদ্মজা সারাক্ষণ 'উনি,উনি' করে গেছে। ফরিনা কোনো জবাবই দিলেন না। আর দরজার ওপাশে সারাক্ষণ লতিফা ছিল। পূর্ণা অনেকবার লতিফাকে ধরেছে। তখন লতিফা হেসে বলেছে, পদ্ম আপা কেমন আছে, দেখতে আইছিলাম।' পূর্ণা কঠিনস্বরে অনেকবার নিষেধ করেছে,যেন আর না আসে। তবুও লতিফা এসেছে। পদ্মজা পূর্ণাকে নিষেধ করার পর পূর্ণা স্থির হয়। বিকেল হয়ে যায় তবুও আমিরের দেখা নেই। এদিকে পদ্মজা বিছানায় বসে ইশারায় ফজরের নামায কাযা করেছে।

দুপুরের, আছরের নামাযও বসে বসে ইশারায় করেছে। (অসুস্থ মানুষ অজু ছাড়া কোন উপায়ে নিজেকে পবিত্র করে নামায পড়তে পারে,নামায শিক্ষা ঘাঁটলেই পাবেন।) ফরিনা দুপুরে না করেছিলেন,'এতো কষ্ট কইরা নামাযের কী দরহার! কইরো না। আল্লাহ মাফ করব এমনিতে।'
পদ্মজা তখন মিষ্টি করে হেসে জবাব দিয়েছিল,'যতক্ষণ হুঁশজ্ঞান আছে নামায ছাড়ার পথ নেই আম্মা। আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ মানুষকে ইশারায় নামায পড়ারও পথ দিয়েছেন। এটা কেন দিয়েছেন? নামায বাধ্যতামূলক বলে। ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অনেক বেশি আম্মা।'

ফরিনা এই কথার উপরে কিছু বলতে পারেননি। পদ্মজা ধর্মকর্ম নিয়ে খুব জানে। পদ্মজার কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু

শিখেছেন। ধর্মের কথা বলার সময় পদ্মজা অন্য সবকিছু ভুলে যায়। তাই পুরোটা দুপুর তিনি পদ্মজাকে ইসলাম ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন করেই গেছেন। বিকেলবেলা পূর্ণা জানাল,সে আজ এই বাড়িতে থাকবে। পদ্মজা এ কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে জোরাজুরি করে পূর্ণাকে মোড়ল বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এই বাড়ি মোটেও সুবিধার না। সে ঝুঁকি নিতে চায় না। পূর্ণা চলে যাওয়ার আগে পদ্মজা কিছু সূরার নাম বলে দেয়। একটা দুই লাইনের সূরা শিখিয়ে দেয়। যেন পড়ে ঘুমায়। তাহলে বিপদ হবে না।

পূর্ণা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আযান পড়ে সন্ধ্যার। পূর্বের নিয়মেই নামায পড়ে পদ্মজা। ফরিনা পদ্মজার ঘর ছাড়েন। রান্নাঘরে যান। পদ্মজা নামায শেষ করে বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বুজে। আমিরের জন্য খুব চিন্তা

হচ্ছে। দুইদিন কেটে যাচ্ছে আমিরের দেখা নেই। পদ্মজার মনের অবস্থা করুণ। বার বার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। প্রহর গুণছে এই বুঝি মানুষটা চলে এলো। পদ্মবতী, পদ্মবতী বলে একাকার করে দিল ঘর। কিন্তু আসে না। পদ্মজার বুকের বাম পাশে চিনচিন ব্যথা বেড়েই চলেছে। গতকাল রাতে আক্রমণ করা লোকটিকে সে তখন চিনতে পারেনি। কিন্তু এখন আন্দাজ করতে পারছে। তবে আমিরের শূন্যতা তাকে পোড়াচ্ছে খুব। সে এমন ছটফটানি নিয়ে আর থাকতে পারছে না। আহত পা মাটিতে রাখে। ভর দিতেই আবার সেই তীব্র ব্যথা। কিন্তু এর চেয়েও গভীর ব্যথা আমিরের দেখা না পাওয়া। পদ্মজার দুই পায়ের পাতার এক পাশ অক্ষত। সে ওই এক পাশ দ্বারা মাটিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এক তলায় যায়। সোজা চলে আসে রিদওয়ানের ঘরে। দরজা একটু খোলা ছিল। পদ্মজা একবার

ভাবল,কড়া নেড়ে ঘরে ঢুকবে। কী মনে করে যেন,আর কড়া নাড়ল না। সোজা দরজায় ধাক্কা মারে। তখনই রিদওয়ান চমকে ঘুরে তাকায়। পদ্মজাকে দেখে তাড়াতাড়ি শার্ট পরতে উদ্যত হয়। পদ্মকা মুচকি হেসে বলল,'শার্ট পরে লাভ নেই। চোখে পড়ে গেছে।'
রিদওয়ান ফিরে দাঁড়াল। লম্বা করে হেসে শার্ট পরল। তারপর বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল,'বুদ্ধিমতী। তো দেখতে এসেছো কেমন আছি?
ভালো নেই। ছুরি এবং ছুরির মালিক দুজনেরই তেজ বেশি ছিল।'
পদ্মজা তিরষ্কার করে হাসল। দুই কদম এগিয়ে এসে বলল,'পাগলের প্রলাপ! আন্দাজ ঠিক হবে ভাবিনি। এবার বলুন,উনি কোথায়?'
রিদওয়ান ভ্রু দুটি বাঁকিয়ে বলল,'আমির?'
পদ্মজা জবাব দিল না। রিদওয়ান বলল,'আমি

জানব কী করে,তোমার জামাই কোথায়?’
‘জানেন না?’ পদ্মজার কড়া প্রশ্ন।
রিদওয়ান উত্তরে হাসল। সে আলমারি থেকে একটা ছুরি বের করে দেখল। তারপর শীতল স্বরে প্রশ্ন করল,’ তোমার ছুরিটার নাম কী? কোন দেশ থেকে এনে দিয়েছে আমির?’
‘ফুটপাত থেকে কেনা। ছুরির ধার থাকলেই চলে। অভিজ্ঞ হতে হয় আক্রমণকারীর হাত। তাই ছুরির নাম না খুঁজে নিজের হাতটাকে অভিজ্ঞ করুন।’ পদ্মজার সূক্ষ্ম অপমান বুঝতে রিদওয়ানের অসুবিধা হয় না। সে আলমারির কপাট লাগিয়ে এগিয়ে আসে। বলে,’ব্যঙ্গ করছ?’
পদ্মজা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল রিদওয়ানের দিকে। তারপর বলল,’ কী আছে জঙ্গলে?’
‘তা জেনে তুমি কী করবে?’
‘কোন অপরাধ চলছে?’

‘তোমাকে জানতে হবে না।’
‘তখনও তো মারতে এসেছিলেন। এখন তো কাছে আছি,আক্রমণ করছেন না কেন?’
রিদওয়ান হাসল। পদ্মজার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। পদ্মজার ঘাড়ে ফুঁ দেয়। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজা দূরে সরে যায়। হুমকি দিয়ে বলে,’নোংরামি করার সাহস করবেন না। তখনের আঘাতগুলো ভুলে যাবেন না। আমি আমাকে রক্ষা করতে জানি।’
‘এজন্যই পালিয়ে এসেছিলে?’
‘পদ্মজা ক্ষণকালের জন্য পালিয়েছে। যা ই থাকুক আমি খুঁজে বের করবই। আর ধ্বংসও করব আমি।’
‘দেখো,পদ্মজা তুমি আর এসব ঘেঁটো না। সুখে আছো সুখে থাকো। পরিণতি খারাপ হবে। ভালো করে বলছি,ঢাকা ফিরে যাও। এমুখো আর তাকিও না।’

‘ভয় পাচ্ছেন?’
‘কাকে? তোমাকে?’ রিদওয়ান সশব্দে হাসল। রিদওয়ানের হাসি পদ্মজার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। রিদওয়ান হাসতে হাসতে বলল,’ তোমাকে ভয় পাবে রিদওয়ান?’
‘উনি কোথায় সত্যি জানেন না?’
‘না,জানি না। ‘
‘আমি কিন্তু-
‘কী করবে? খুন করবে?’ রিদওয়ান কিড়মিড় করে এগিয়ে আসে। পিছন থেকে পদ্মজার দুই হাত মুচড়ে ধরে বলল,’ভালো করে বলছি,আর গভীরে যেও না। এককালে তোমাকে বিয়ে করার কথা ভেবেছিলাম বলে বলছি, আর গভীরে যেও না। তোমার করুণ দশা আমিও আটকাতে পারব না।’
‘ছাড়ুন আমাকে।’
‘ছাড়ব না।’ রিদওয়ান পদ্মজার কাঁধে ঠোঁট

ছোঁয়াতেই পদ্মজার সারা শরীর রি রি করে উঠে। মাথা দিয়ে পিছনে থাকা রিদওয়ানের মুখে আঘাত করে। রিদওয়ান কিছুটা পিছিয়ে যায়। নাকে ভীষণ ব্যথা পেয়েছে। সে কিড়মিড় করে হিংস্র জন্তুর মতো তাকায়।
বলিষ্ট,মোটাসোটা শরীরটাকে হারানো যেকোনো মেয়ের জন্য অসাধ্য। পদ্মজা নিজেকে রক্ষা করার জন্য টেবিল থেকে জগ নেয় হাতে। রিদওয়ান বলে,'তুমি বাড়াবাড়ি করছো পদ্মজা।'
'উনি যদি জানতে পারে আপনি আমার সাথে এই অসভ্যতামি করেছেন, আপনার দেহে প্রাণ থাকবে না।'
রিদওয়ান ফিক করে হেসে দিল। যেন মাত্রই পদ্মজা মজার কথা বলল। রিদওয়ান হাসি ঠোঁটে রেখে বলল,'আগে তো ও নিজেকে বাঁচাক। তারপর আমাকে প্রাণে মারবে।'

রিদওয়ানের এই কথাটি যেন বজ্রপাত ঘটায়। পদ্মজা চিৎকার করে জানতে চায়,'কোথায় রেখেছেন উনাকে? কী করেছেন উনার সাথে?'
'ঘরে যাও পদ্মজা।'
'আপনি বলুন,উনি কোথায়।'
'যাও ঘরে।'
'বলুন আপনি।'
'পদ্মজা-
পদ্মজা জগ ছুঁড়ে মারে রিদওয়ানের দিকে। রিদওয়ান সরে দাঁড়ায়। জগ স্টিলের থালাবাসনের উপর পড়ে। বিকট শব্দ হয়। সেই শব্দ শুনে খলিল ছুটে আসেন। ছুটে আসেন মজিদ। আসেনি একজন মহিলাও।
পদ্মজা বিছানার উপর ছুরি দেখে দ্রুত হাতে তুলে নেয়। সে তার নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে রিদওয়ানকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। রিদওয়ান ছুরি সহ পদ্মজার হাত ধরে ফেলে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে,' তোমার তিন

বছরের ছুরি চালানোর অভিজ্ঞতা আর আমার বিশ বছরের পেশা। পেরে উঠতে পারবে না।’

পদ্মজার হাত থেকে খলিল ছুরি টেনে নেয়। পদ্মজা হিংস্র বাঘিনী হয়ে উঠে। আমিরের শোকে তার মাথা কাজ করছে না। দুই দিন হয়ে গেল আমিরের দেখা নেই। সারা শরীরে ব্যথা। তার নিজেকে উন্মাদ মনে হচ্ছে। সে রাগে রিদওয়ানের গলা চেপে ধরে। রিদওয়ান পদ্মজার হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করে। পদ্মজাকে নানাভাবে আঘাত করে। পদ্মজা কিছুতেই ছাড়ে না। তার শরীরের শক্তি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আমির তার জীবনে কতোটা মূল্যবান তা কেউ জানে না। আমিরের জন্য সে সবকিছু করতে পারে। খলিল এক হাতে পদ্মজার চুল মুঠ করে ধরে,অন্য হাতে পদ্মজার গাল চেপে ধরে বলে,’বে*র ছেড়ি,আমার ছেড়ারে ছাড়।’

তাও পদ্মজা ছাড়ে না। মজিদ এগিয়ে আসে। পদ্মজাকে টেনে সরায়। পদ্মজার শরীর কাঁপছে। সে চিৎকার করে বলছে,'উনার কিছু হলে আমি কাউকে ছাড়ব না। মেরে ফেলব। মেরে ফেলব একদম।'

রিদওয়ান ছাড়া পেয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। তারপরই তেড়ে এসে পদ্মজার গালে থাপ্পড় বসায়। পদ্মজার গালের ক্ষত থাপ্পড়ের ভার নিতে পারেনি। চামড়া অনেক বেশি ছিঁড়ে যায়। পদ্মজার দুই হাত মজিদ ধরে রেখেছেন। পদ্মজা মজিদকে খেয়াল করেনি। সে চেঁচিয়ে ফরিনাকে ডাকে,'আম্মা,আম্মা আপনি কোথায়? আম্মা ওরা আপনার ছেলেকে মেরে ফেলবে। আম্মা...'
ফরিনা আসেন না। খলিল হুংকার ছাড়েন,'এই খা*কির ছেড়ির আগুন বেশি গত্রে। ছেঁইড়া দে রিদু।'

পদ্মজার কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে মুখভর্তি থুথু ছুঁড়ে দেয় খলিলের মুখের উপর। তাৎক্ষণিক রিদওয়ান পদ্মজার শাড়ির আঁচল দিয়ে পদ্মজারই গলা পেঁচিয়ে ধরে কিড়মিড় করে বলল,'এই মা*র ঝি, তোরে অনেক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছিলাম। ভালো কথা কান দিয়ে ঢুকে না? মায়ের মতো হইছস? তোর মারেও মেরে দিতাম। যদি নিজে থেকে না মরতো।'

পদ্মজার চোখ উল্টে যাচ্ছে। মজিদ রিদওয়ানকে বলে,'রিদওয়ান ওরে ছেড়ে দে। মরে যাবে।'

রিদওয়ান তাও ছাড়ে না। খলিল রিদওয়ানকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরালেন। পদ্মজার শরীরের সব শক্তি শেষ। সে কাশতে কাশতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। চোখ বুজে আসে। কল্পনায় ভেসে উঠে,আমিরের শ্যামবর্ণের মায়াময় মুখ। আর মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে ডাকে, আম্মা।

তারপরই জ্ঞান হারায়। তিনজন পুরুষের মাঝে লুটিয়ে পড়ে আছে পদ্মজা। বুকে শাড়ি নেই। খয়েরি রঙের ব্লাউজ পরা। গলায় লাল দাগ। মুখে নখের আঁচড়। গালে চেপে ধরার দাগ। চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ার রক্ত। ফর্সা দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরার দাগ জ্বলজ্বল করে ভেসে আছে। চুল কয়টা ছিঁড়ে পড়ে আছে আশেপাশে। পায়ের সাদা ব্যান্ডেজ আবার লাল হয়ে উঠেছে। আগুন সুন্দরী পদ্মজার খুঁতহীন রূপে খুঁতের মেলা বসে গেছে! জানালা দিয়ে আসা উত্তরে হাওয়ায় হুঁশহারা পদ্মজার রক্ত ধীরে ধীরে শুকাতে থাকে। কেউ নেই তাকে বুকে আগলে ধরার জন্য। পদ্মজার অবস্থা দেখে যেন ঘরের দেয়ালগুলোও গুমরে গুমরে কাঁদছে।

চলবে...